রঘুনাথ দাস গোস্বামী

(পূজ্যপাদ গোস্বামীপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী)

"শ্রীগৌরাঙ্গ হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি"

রঘুনাথ

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

।। রঘুনাথ দাস গোস্বামী ।।

সপ্তগ্রামের অন্যতম গ্রাম কৃষ্ণপুর বর্তমানে একটি সামান্য স্থান হইলেও প্রাচীনকালে ইহা একটি তীর্থস্থান এবং ভারতের অন্যতম প্রধান নগর ও প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া পরিচিত ছিল। পুণ্যতোয়া বিশালকায়া সরস্বতী নদী এই অঞ্চলের নিম্ন দিয়া কুলু কলু স্বরে প্রবাহিত হইত এবং বিদেশীয় বাণিজ্যপোতগুলি তখন পৃথিবীর রত্নরাজি এই দেশে বহন করিয়া আনিত। পর্তুগীজ ঐতিহাসিক ডি-বারো [De-Burros] লিখিয়াছেন 'বাণিজ্য-তরীর প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ সম্বন্ধে যদিও চট্টগ্রাম অধিকতর সুবিধাজনক তথাপি সপ্তগ্রাম বন্দর খুব বৃহৎ এবং সপ্তগ্রাম একটি শ্রেষ্ঠ সহর।' কৃষ্ণপুর বর্তমানে কোদালিয়া-দেবানন্দপুর ইউ-নিয়নের অন্তর্ভুক্ত অজ্ঞাত অখ্যাত বৈশিষ্ট্যহীন একটি ছোট গ্রাম। কলিকাতা হইতে সাতাশ মাইল দূরে অবস্থিত। সপ্তগ্রামের সহিত কৃষ্ণপুর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট আকবরের রাজস্ব সচিব টোডরমল্ল রাজস্ব-নির্ধারণ কল্পে বঙ্গদেশকে ১৯ সরকারে এবং ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করেন। উক্ত সময়ে সপ্তগ্রাম 'সরকার সাতগাঁও' নামে অভিহিত হইত এবং ইহার মধ্যে ৫৩ পরগণা ছিল; কলিকাতা শালকিয়া ব্যারাকপুর, নদীয়া ২৪ পরগণা প্রভৃতি স্থানগুলি সপ্তগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ৪ লক্ষ ৮ হাজার ১ শত টাকা 'সরকার সাতগাঁও' হইতে সম্রাটকে রাজস্ব ও যুদ্ধের সময় পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সৈন্য এবং ছয় হাজার পদাতিক সৈন্য শাসনকর্তাকে দিতে হইত।

বাঙ্গলাদেশের প্রথম সাময়িকপত্র 'দিগদর্শন' নামক মাসিক পত্রের পঞ্চম ভাগে বাঙ্গলার প্রধান নগর বিষয়' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত আছে 'সাতগাঁ হুগলীর উত্তর পশ্চিমে দুই ক্রোশ দূরে। আড়াই শত বৎসর হইল সে বাণিজ্যের কারণ গতায়াত ছিল সে এই শহরে এবং সেই সময়ে সরস্বতী নদী এমত আয়তা ছিল যে অল্প বোঝাই জাহাজ চলিত।'

বহু প্রাচীনকাল হইতে এই স্থান হিন্দুদিগের দ্বারা শাসিত হইয়াছিল। কোন সময়ে কোন রাজা এই স্থানের অধিপতি ছিলেন তাহার পূর্বাপর ইতিহাস না পাওয়া যাইলেও শত্রুজিৎ নামক এক রাজা যে এই স্থানে রাজত্ব করিতেন তাহা কবি কৃষ্ণরাম কৃত ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে রচিত 'ষষ্ঠীমঙ্গল' গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়। কালপ্রবাহে ভারতের এই প্রাচীনতম সহর কিভাবে অবলুপ্ত হয় তাহা পূর্বে বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইয়াছে।

১২৪২ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম মুসলমান অধিকারভুক্ত ছিল না এবং হিন্দু রাজা স্বাধীনভাবে এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। আচার্য যদুনাথ সরকার বলেন ঃ

Saptagram was still unsubdued and the district of Nadia was strewn with semi-independent Hindu Rajas.

পাঠান রাজত্বকালে দিল্লীর বাদশার অধীন, এক শাসনকর্তার দ্বারা এই স্থান শাসিত হইত, পরে রাজা হিরণ্যদাস মজুমদার ও তদীয় ভ্রাতা গোবর্দ্ধনদাস মজুমদার একত্রে সপ্তগ্রামের শাসনকার্যের ভার প্রাপ্ত হন। ইহারা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ এবং 'মজুমদার' নবাব প্রদত্ত উপাধি ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে, তাঁহারা এই স্থান শাসন করিতেন বলিয়া জানা যায়। এই 'মজুমদার' বংশ ধনে মানে তৎকালে যে প্রধান ছিল তাহারও বহু প্রমাণ আছে। রাজা হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভাই সদাচারী, ধার্মিক ও বদান্যতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। গঙ্গাতীরবর্তী বহু পণ্ডিত তাঁহাদের নিকট হইতে বৃত্তি পাইতেন এবং তাঁহাদের প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি দানের বহু নিদর্শন পুরাতন কাগজ পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ সকলেই এই কায়স্থ পরিবারের বৃত্তিভোগী ছিল (শান্তিপুর পরিচয়—১ম, পৃঃ ১৯৮) তাঁহাদের সপ্তগ্রাম হইতে বার্ষিক আয় ত্রিশ লক্ষ টাকা ছিল এবং তাঁহারা গৌড়েশ্বরকে বার লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতেন। এই সম্বন্ধে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' যাহা লিখিত আছে, নম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি ঃ

'হেনকালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী
সপ্তগ্রাম মুলুকের সে হয় চৌধুরী ॥
হিরণ্যদাস মুলুক নিল মোকতা করিয়া।
তার অধিকার গেল মরে সে দেখিয়া ॥
বার লক্ষ দেন রাজায় সাধেন বিশ লক্ষ।
সেই তুরুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ ॥'

রাজা হিরণ্যদাস নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবর্দ্ধনদাসের ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে একটি পুত্র জন্মিয়াছিল তাহার নাম রঘুনাথ। রাজবংশের একমাত্র পুত্র বলিয়া উভয় ভ্রাতারই এই শিশু বিশেষ আদরের ছিল। 'রাধাকৃষ্ণ' রাজবংশের কুলদেবতা ছিল এবং গোবর্দ্ধন মহাসমারোহের সহিত নবজাত পুত্র হওয়ায় বিগ্রহের একটি সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করান। এই দুই ভাই ধার্মিক এবং অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ইহাদের অর্থ সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। ইহাদের দানশীলতার কথা সঙ্গীত মাধব নাটকে' উল্লিখিত আছে ঃ

'পাতালে বাসুকির্বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতি ঃ।
গৌড়ে গোবর্দ্ধনো দাতা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ।'

গোবর্দ্ধনদাসের বদান্যতায় বাংলাদেশে বহু ব্রাহ্মণ জীবিকা নির্বাহ সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত থাকিত এবং সহস্র সহস্র দীনদুঃখীও তাঁহার অপার কৃপায় সুখে স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিত। এই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি উল্লেখ্য ঃ

'মহৈশ্চর্য্যযুক্ত দোঁহে বদান্য ব্রাহ্মণ্য।
সদাচার সৎকুলীন ধার্মিক-অগ্রগণ্য ॥
নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায়।
অর্থভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায়।'

ইহাদের শাসনকালে পর্তুগীজগণ বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্য বঙ্গদেশে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম আগমন করেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন যে 'সাজাহান' নামক পারস্য গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যখন হুগলী হিন্দুরাজার শাসনাধীনে ছিল তখন ঘরবাড়ী নির্মাণের

জন্য জমি খরিদ করিবার অনুমতি একদল বণিক পাইয়াছিলেন। হাণ্টার সাহেব হুগলীতে যে হিন্দু রাজার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; ঐতিহাসিকগণ উক্ত রাজাকে গোবর্দ্ধন দাস মজুমদার বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; কারণ ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজগণ প্রথম বঙ্গদেশে আগমন করেন, এবং উক্ত সময়ে গোবর্দ্ধন মজুমদার ব্যতীত আর কেহ হুগলীতে রাজত্ব করিতেন না। রঘুনাথ ঐশ্বর্য্যের ও বিলাসের ক্রোড়ে শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। রাজা হিরণ্যদাস রঘুনাথের সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তৎকালীন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীমদ্ বলদেব আচার্য্যকে নিযুক্ত করেন। রঘুনাথ অতিশয় মেধাবী ছিলেন; অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। রঘুনাথ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন এবং তাহার শিক্ষাগুরু শ্রীমদ বলদেব আচার্য্যও ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। রঘুনাথ ব্রজের রসমঞ্জরী, কেহ কেহ ব্রজের রতিমঞ্জরী আবার কেহ কেহ বা তাঁহাকে ভানুমতীও বলিয়া থাকেন। এই তিনজনের ভাব তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল।

শ্রীমদ্ হরিদাস ঠাকুর ঠিক এই সময়ে ঘটনাচক্রে বলদেব আচার্য্যের গৃহে অতিথি হন। রঘুনাথ হরিদাস ঠাকুরের অসাধারণ ভগবদ্ প্রেম দেখিয়া তন্ময় হইয়া পড়েন এবং তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন।

কিছু দিন পরে, যে দিন শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন তখন সেই সংবাদ বঙ্গের চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইল এবং রঘুনাথ নারায়ণের অবতারকে সেই সময় দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। বলাবাহুল্য পূর্ব হইতেই হরিদাস ঠাকুরের নিকট মহাপ্রভুর নাম শ্রবণ করিয়া অবধি, তাঁহার শ্রীচরণে তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ অদ্বৈতাচার্য্যের আলয়ে যখন মহাপ্রভু পদার্পণ করেন, তাঁহার বাটীতে যাইয়া তিনি সর্বপ্রথম তাহার প্রেমময় মূর্তি অবলোকন করিলেন। এই স্থানে সাত দিন অতিবাহিত করিবার পর, তাঁহার আর ঘর-সংসার ভাল লাগিল না। কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন: 'রঘুনাথ এখনও তোমার সময় হয় নাই, এখন স্থির হইয়া গৃহে যাও যখন চঞ্চল হৃদয় যথার্থ স্থির বৈরাগ্যের উপযোগী

হইবে তখন স্বয়ং ভগবানই তোমার পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন এবং তোমাকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবেন।'

মহাপ্রভুর আদেশে রঘুনাথ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন বটে, কিন্তু তিনি 'রাধাকৃষ্ণের' মন্দিরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের জন্য এরূপ আত্মহারা হইতেন যে জনক ও জ্যেষ্ঠতাত তাহা দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এইভাবে একবৎসর কাটিল, তাঁহার পিতামাতা রঘুনাথের সহিত এক সুন্দরী কন্যার বিবাহের স্থির করিলেন। রঘুনাথ তাহা জানিতে পারিয়া একদিন রাত্রে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

'এই মত রঘুনাথের বৎসরেক গেল।
দ্বিতীয় বৎসরে মন পলাইতে কৈল।
রাত্রে উঠি একলা চলিল পলাইয়া।
দূরে হইতে পিতা তারে আনিল ধরিয়া।'

রঘুনাথ বাড়ী ফিরিয়া সর্বদাই বিভোর হইয়া থাকিতেন, তাঁহার তীব্র অনুরাগ কিছুতেই বাধা মানিতে চাহিল না। জ্যেষ্ঠতাত, পিতামাতা প্রত্যেকেই রঘুনাথের জন্য বিষণ্ণ ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে গৃহাশ্রয়ী করিবার জন্য তাঁহারা যুক্তি করিয়া এক রূপ-লাবণ্যবতী সর্বগুণালঙ্কৃতা কন্যার সহিত রঘুনাথের বিবাহ দিলেন।

পার্থিব ভোগবিলাসে রঘুনাথকে আকৃষ্ট করা গেল না, বরং তাঁহার হৃদয়ে দারুণ বৈরাগ্য উপস্থিত হইল। তাঁহার স্নেহময়ী মাতা ও প্রেমময়ী পত্নী কাঁদিতে লাগিলেন, সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। রঘুনাথ পুনঃ পুনঃ পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া, তাঁহাকে বন্ধন করিয়া রাখিবার প্রস্তাব তাঁহার পিতার নিকট করায়, তিনি বলিয়াছিলেন যে রাজ ঐশ্বর্য ও অপ্সরার মত স্ত্রী যাঁহাকে বন্ধন করিতে পারে নাই, দড়ির বন্ধন তাঁহাকে কি করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে?

'ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য, স্ত্রী অপ্সরাসম।
এ সব বান্ধিতে যার নারিলেক মন।

দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে ?
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ ঘুচাইতে ।'

রঘুনাথ এই সময় পানিহাটী গ্রামে শ্রীমদ্ নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত মিলিত হন। তিনি তাঁহার অতুলনীয় ভক্তি উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন যে, রঘুনাথ আমি আজ তোমাকে দণ্ডিত করিব ; তুমি আমার শিষ্যগণকে চিঁড়াদধি ভোজন করাও। রঘুনাথ প্রেমে গদগদ হইয়া পরমানন্দে মহাপ্রভু এবং তাঁহার শিষ্যবর্গকে চিঁড়া-দধি ভোজন করাইয়াছিলেন। প্রভু বলিলেন ঃ শীঘ্র তুমি নীলাচলে যাইতে সমর্থ হইবে। প্রভু তোমাকে স্বরূপ দামোদরের হাতে সমর্পণ করিবেন। ইহার পর তাঁহার গৃহত্যাগের সুযোগ হইল। আজও পানিহাটী গ্রামে পুণ্যসলিলা জাহ্নবী তীরে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে উক্ত চিঁড়া দধি মহোৎসবের স্মৃতি স্মরণার্থে বৈষ্ণবগণ 'দণ্ডমহোৎসব লীলা'র অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

'পানিহাটী গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন।
কীর্তনীয়া সেবকগণ সঙ্গে বহুজন ॥
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয় ॥
নিকটে না আইস মোর, ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছো, দণ্ডিমু তোমারে ॥
দধি চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনি আনন্দিত হৈল রঘুনাথ মনে ॥'

পানিহাটীতে গঙ্গারধারে বটবৃক্ষ তলে শ্বেতপাথরে এই কথাগুলি খোদিত আছে ঃ

প্রেমের অবতার দয়ারসাগর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কর্তৃক
১৪৩৮ শকে জ্যৈষ্ঠ শুক্লা এয়োদশীতে
এই স্থানে
শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর
কৃপাদণ্ড মহোৎসব লীলা

অতঃপর রঘুনাথ প্রতিদিন ষোল ক্রোশ করিয়া পথ অতিক্রম করিয়া দ্বাদশ দিনে পদব্রজে নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সহিত মিলিত হন। নীলাচলে যাইতে তাঁহাকে হিংস্র জন্তুসমাকুল নিবিড় বন ও প্রান্তর এবং মকর ও নক্র বিশিষ্ট নদী সকল সন্তরণ করিয়া যাইতে হইয়াছিল।

নীলাচলে উপস্থিত হইয়া তিনি কয়েক বৎসর শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত বাস করেন। মহাপ্রভু তাঁহার অসাধারণ প্রেমের একাগ্রতা দেখিয়া তাঁহাকে শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করেন। শ্রীপাদ স্বরূপ গোস্বামী রঘুনাথকে ভক্তির উপযুক্ত আধার বিবেচনা করিয়া দীক্ষা প্রদান করেন এবং সাধ্য সাধনতত্ত্ব প্রণালী শিক্ষা দেন। রঘুনাথ যে অনন্যসাধারণ কৃচ্ছতা সাধন করিয়া ভক্তির সকল অঙ্গ যাজন মার্গের শীর্ষস্থানে উন্নীত হইয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইয়া যাইতে হয়। তিনি স্থান, আহার ও নিদ্রার জন্য মাত্র তিন ঘণ্টা সময় রাখিয়া, প্রতিদিন একুশ ঘণ্টা হরিনাম সঙ্কীর্তনে বিভোর হইয়া থাকিতেন। রঘুনাথের পিতা তাঁহার জন্য অর্থাদি পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু তিনি সে অর্থ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, ছত্রে ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিতেন। তাঁহার বৈরাগ্য ও নিয়ম-নিষ্ঠা বিস্ময়ের বস্তু ছিল। স্বরূপের সঙ্গে তিনি ষোল বৎসর মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিয়াছিলেন।

'তোমা লাগি রঘুনাথ সব ছাড়ি আইল।
হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল॥
তোমার চরণ কৃপা হঞাছে তাহারে
ছত্রে মাগি খায়, বিষয় স্পর্শ নাহি করে॥"

এই সময় রঘুনাথের শোকে তাঁহার মাতা ও পত্নী লোকান্তরিতা হন। নীলাচল হইতে তিনি কয়েক বৎসর পুরীধামে অতিবাহিত করিয়া মহাপ্রভু প্রদত্ত এক সাক্ষাৎ মোহন-মুরলীধারী শিলারূপী মদনমোহন বিগ্রহ লইয়া একবার সপ্তগ্রামে প্রত্যাগমন করেন। সপ্তগ্রামে তাঁহাদের 'রাধাকৃষ্ণের' মন্দিরে তিনি উক্ত মদনমোহনকে প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। রঘুনাথ আসিয়াছে শুনিয়া দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। বৈষ্ণবগণ

আসিয়া হরিনাম সঙ্কীর্তনে সপ্তগ্রামকে মাতাইয়া তুলিল। শ্রীমদ নিত্যানন্দ প্রভুও সপ্তগ্রামে আসিয়া রঘুনাথের সঙ্গে যোগ দিলেন; সপ্তগ্রামের দেবালয় বৈকুণ্ঠালয়ে পরিণত হইল।

মহাপ্রভুর পার্ষদগণ যখন বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যান রঘুনাথও সেই সময় বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার পিতা জ্যেষ্ঠতাত পরলোকগমন করেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনে শ্যামাকুণ্ড বিদ্যমান আছে; কিন্তু সাড়ে-চার শত বৎসর পূর্বে উক্ত কুণ্ডদ্বয়ের চিহ্ন মাত্র ছিল না। যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে কয়েকটী জলাভূমিকে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড বলিয়া দেখাইয়া দেন। রঘুনাথ সেই স্থানটীকে ভগবৎ আরাধনার উপযুক্ত স্থান ভাবিয়া, তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহার মানসিক বলে একটী আশ্চর্য ঘটনা সংঘটিত হয় একদিন রঘুনাথের ইচ্ছা হইল যে, কি উপায়ে এই পুণ্য জলাশয় দুইটিকে পূর্বের ন্যায় বিশালকায় করিতে পারা যায়। এইরূপ চিন্তায় কয়েকদিন অতিবাহিত করিতেছেন এমন সময় বহু ধনরাশি লইয়া এক ব্যক্তি আসিয়া রঘুনাথকে বলিলেন যে বদরিকাশ্রমের শ্রীশ্রীনারায়ণ জীউর আদেশে তিনি ধনরত্ন লইয়া আসিয়াছেন তিনি স্বপ্নে বলিয়াছেন, যে, শ্রীমদ্ রঘুনাথ গোস্বামীর নিকট যাইয়া এই ধন রত্ন অর্পণ করিয়া বলিও যে তিনি যেন রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড খনন করিয়া দেন। রঘুনাথ ও তাঁহার শিষ্যগণ পুলকে কাঁদিতে লাগিলেন এবং অচিরে কুণ্ড দুইটি স্বচ্ছ জলাশয়ে পরিণত হইল। রঘুনাথ শ্রীবৃন্দাবনের কৃষকদের নিকট হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডের যে সকল জমি খরিদ করেন তাহার পাঁচখানি দলিল বরাহনগরে শ্রীমদ্ ভাগবতাচার্যের পাঠবাড়িতে সংরক্ষিত আছে। শ্রীরাধাকুণ্ডে তিনি এরূপ কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন যে, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান একপ্রকার লোপ পাইল।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমানগণ পুনরায় সপ্তগ্রাম কাড়িয়া লন এই স্থান মুসলমান শাসনকর্তার দ্বারা শাসিত হয়। মুসলমান রাজত্বকালে এই প্রাচীন স্থানের যাবতীয় হিন্দু মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া করিয়া সেই স্থানে মস্‌জিদ নির্মিত হইয়াছিল। আকবরের সময় এই

স্থানের অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে. তৎকালীন লেখকগণ এই স্থানকে "দস্যুস্থান" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সপ্তগ্রামে তৎকালীন অবস্থার কথা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে বলিয়া এইস্থানে আর পুনরুল্লিখিত হইল না।

মুসলমান রাজত্বে রঘুনাথের বাড়ী ধ্বংস হইল এবং মন্দির অপবিত্র হইবার পূর্বেই মন্দিরের পূজারী-ব্রাহ্মণ 'রাধাকৃষ্ণ' এবং 'মদনমোহনের' বিগ্রহগুলি মন্দিরের পার্শ্বে সরস্বতী নদীর তীরে প্রোথিত করিয়া প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিলেন; রাজবাড়ীর কুল-দেবতার মন্দির ধ্বংস হইল। সম্প্রতি এই গ্রন্থের লেখক কৃষ্ণপুর হইতে রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের কারুকার্য -খচিত একখানি ইষ্টক আবিষ্কার করিয়াছেন এই সম্বন্ধে ১৩৬৮ সালের ৬ই মাঘ তারিখের "যুগান্তর" পত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা উল্লেখ্য ঃ

পঞ্চদশ শতাব্দীর ইঁটে কারুকার্য।। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার

গত ১৪ই জানুয়ারী রবিবার 'হুগলী জেলার ইতিহাস লেখক শ্রীসুধীরকুমার মিত্র উত্তরায়ণ মেলা উপলক্ষে কৃষ্ণপুরে গিয়া ইটের স্তুপ হইতে কারুকার্য খচিত চতুষ্কোণাকার একখানি মন্দিরের ইট আবিষ্কার করিয়াছেন। ইটখানিতে একটি সুন্দর পদ্মফুল খোদিত আছে এবং দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে উহার আয়তন নয় বর্গ ইঞ্চি। শ্রী মিত্র কারুকার্য খচিত এই ইটখানি শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের অন্যতম ইট বলিয়া মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে পঞ্চাদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রাম হিরণ্যদাস মজুমদার ও গোবর্ধনদাস মজুমদার কর্তৃক শাসিত হইত। এই রাজবংশে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করিলে নবজাত পুত্রের মঙ্গল কামনায় কৃষ্ণপুরে তৎকালীন সপ্তগ্রামের অধিপতি রাধাকৃষ্ণের এক সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরে রঘুনাথ গোস্বামী মহাপ্রভুর কৃপালাভ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে সপ্তগ্রাম রাজ্য মুসলমানগণ অধিকার করে এবং তাহারা হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়া দেয়। পরবর্তীকালে এই মন্দিরের বিগ্রহগুলি সরস্বতী নদী হইতে উদ্ধার করিয়া একটি গৃহে সংরক্ষণ করা হয়। রঘুনাথ দাসের এই মন্দিরের কথা ইতিহাসে লেখা থাকিলেও কোন নিদর্শন এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই।

তিনিআরও বলেন যে সপ্তগ্রাম এলাকাস্থিত এই প্রাচীন স্থানগুলি খনন করিলে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য আবিষ্কৃত হইবে। এই রাঢ় অঞ্চল হইতে প্রাচীন কোন দ্রব্য যাহাতে অপসারিত না হয় সেই দিকে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি দেওয়া উচিত বলিয়া শ্রী মিত্র মন্তব্য করেন। তিনি ইটখানিকে বরাহনগর পাটবাড়ীর বৈষ্ণব প্রত্নশালায় অর্পণ করিবেন বলিয়া জানা যায়।

আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে (৯ মাঘ ১৩৬৮) এই স্থানে প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতে পারে বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করিবার জন্য যে আবেদন এই সম্পর্কে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাএই ঃ

ইতিহাসে লিখিত গ্রন্থে সপ্তগ্রামের নানা প্রসিদ্ধির উল্লেখ আছে। রাজনীতিক, বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্বে সপ্তগ্রাম একদিন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপদে পরিণত হইয়াছিল। সপ্তগ্রামের দুর্ভাগ্য, ধর্মদ্বেষী আক্রমণকারীর অভিযান তাহার স্থাপত্যগৌরবের অজস্র নিদর্শন ধূলিস্যাৎ করিয়া দিয়াছেন। সপ্তগ্রামের কৃষ্ণপুরে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর যে রাধাকৃষ্ণ মন্দির স্থাপিত ছিল, তাহা খুব সম্ভব পঞ্চদশ শতকেই আক্রমণকারীর হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের কোন চেষ্টা হইয়াছে কি না জানি না। কিন্তু এরূপ চেষ্টা হইলে শুধু পঞ্চদশ শতকের হিন্দু মন্দিরটির সম্পর্কে নহে, সপ্তগ্রামেরই প্রাচীন ইতিহাসের সম্পর্কে নানা বাস্তব তথ্যের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতে পারে। কৃষ্ণপুরের ভগ্নস্তূপের ভিতর হইতে এমন ইষ্টকখণ্ডও পাওয়া গিয়াছে যাহাকে প্রাচীন রাধকৃষ্ণ মন্দিরের ইষ্টক বলিয়া অনুমান করিতে পারা যায়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সপ্তগ্রামের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালাইবার ব্যবস্থা করিলে তাহা অবশ্যই সুবিবেচিত উদ্যম বলিয়া প্রশংসিত হইবে। এই সংবাদের আলোকচিত্র ১০৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। সপ্তগ্রামে প্রাপ্ত অন্যান্য দ্রব্যের তালিকা অন্যত্র প্রদত্ত হইল।

সপ্তগ্রামের ভগ্ন মসজিদ সম্বন্ধে ব্লকম্যান সাহেব লিখিয়াছেন যে, এই মসজিদের প্রাচীরগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকে রচিত এবং প্রাচীরগুলির ভিতর ও বাহির আরবীয় প্রণালীর কারুকার্যসমঙ্কৃত। মসজিদের অভ্যন্তরে

প্রাচীরে একটি 'কুলঙ্গি' আছে। উহা হিন্দু মন্দিরের খিলানের ন্যায়—দেখিতে অতি সুদৃশ্য। বোধহয় পাঠান রাজত্বের অবসানে এইগুলি নির্মিত হইয়াছিল।

বৃন্দাবনে রঘুনাথ তাঁহার আরাধ্য দেবতার দুর্দ্দশার বিষয় ধ্যানে অবগত হইলেন এবং তাঁহার অন্যতম প্রিয়শিষ্য শ্রীমদ্ কৃষ্ণকিঙ্কর গোস্বামীকে সপ্তগ্রামে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে, সপ্তগ্রামে যাইলেই তিনি যাবতীয় বিষয়ে অবগত হইবেন এবং বিগ্রহগুলিকে পুনরুদ্ধার করিয়া তিনি যেন যথাস্থানে তাঁহাদিগকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। রঘুনাথের কান্যুরারী তদীয় শিষ্য সপ্তগ্রামে আসিয়া বিগ্রহগুলিকে নদীর তীর হইতে উদ্ধার করিলেন এবং নবাবের নিকট হইতে কিছু জমি লইয়া পূর্বোক্ত স্থানেই খরের ঘরে তাঁহাদিগকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন। পরবর্তীকালে স্বর্গীয় দানবীর মতিলাল শীলের পিতামহী বর্তমান গৃহ এবং যে স্থানে বিগ্রহগুলি প্রোথিত ছিল, সেই স্থান ইষ্টক দিয়া বাঁধাইয়া তথায় একটি ঘাট নির্মাণকরাইয়া দেন।

রঘুনাথ বৃন্দাবনে এরূপ কঠোর সাধনা আরম্ভ করিলেন যে, আহার নিদ্রা তাঁহার একপ্রকার লোপ পাইল। অনন্যসাধারণ কৃচ্ছ্রতাসাধন করিয়া তিনি সাধনার চরম সীমায় উপনীত হইলেন এবং ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দের (১৫০০ শকাব্দ) আশ্বিন মাসের শুক্লা দ্বাদশীর দিন রঘুনাথের অমর আত্মা জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত পুরুষে লীন হইয়া গেল। শ্রীমদ্ রঘুনাথ গোস্বামী যে পদ দেখাইয়া গেলেন, তাঁহার শিষ্যগণও সেই পথ অবলম্বন করিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার পরম পবিত্র রাধাকৃষ্ণ লীলাকথাপূর্ণ সুদীর্ঘ জীবন-কাহিনী বৈষ্ণবগণের নিত্য আস্বাদনের বস্তু। মহপ্রভুর পরিকরের মধ্যে ছয়জন গোস্বামী ছিলেন, তন্মধ্যে একমাত্র কায়স্থ হইয়াও মহাপ্রভুর কৃপার এবং নিজ চরিত্রবলে তিনি ব্রাহ্মণ-সদৃশ সর্ববর্ণের পূজনীয় ও প্রণম্য হইয়াছিলেন।

"শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ॥

এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥
এই ছয় গোস্বামী যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥"

শ্রীমদ্ রঘুনাথ গোস্বামীর নিকট হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গ প্রভুর জীবনের ঘটনাবলী অবগত হইয়াই প্রধানতঃ হিন্দুদিগের অমূল্য গ্রন্থ "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচনা করেন। এই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন ঃ

"রঘুনাথ দাসের সদা প্রভু সঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি॥

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র প্রতি পরিচ্ছেদের অন্তে নিম্নোক্ত ভনিতাটি লিখিত আছে ঃ

"শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

তাঁহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, জ্ঞান ও ভক্তির বিষয় গ্রন্থের 'অন্ত্যলীলা' মধ্যে অতি মধুর ও লোকপাবনী ভাষায় বর্ণিত আছে। রঘুনাথ যে সমস্ত অমূল্য ভক্তিমূলক ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহার কতিপয় মুদ্রিত হইলেও, এখনও বহু হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি কীটদষ্ট হইতেছে। উক্ত অপ্রকাশিত পুঁথিগুলি প্রকাশ করিলে কেবল যে বঙ্গভাষা সমৃদ্ধ হইবে তাহা নহে, তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার পথ অবলম্বন করিয়া, দেশবাসী ধন্য ও কৃতার্থ হইবে এবং ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মূর্ত প্রতীক মানব কুলোজ্জ্বলকারী রঘুনাথেরও কীর্তিস্তম্ভ সংরক্ষিত হইবে। সাহিত্য প্রসঙ্গে ৪০৯ পৃষ্ঠায় তাঁহার রচিত একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম ঃ শ্রীস্তবাবলী শ্রীদানচরিত (দানকেলি-চিন্তামণি) ও শ্রীমুক্তাচরিত। পদকল্পতরু গ্রন্থেও তাঁহার কয়েকটি পদ আছে।

সপ্তগ্রামের এই প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের দেবালয় ও রঘুনাথের সাধনক্ষেত্র দেখিয়া আজও ভক্তগণের হৃদয়ে রঘুনাথের দিব্য জ্ঞান ও ভক্তির স্মৃতি জাগ্রত হইয়া উঠে। যে মহাত্মা এই জাতিকে প্রেমময় নামের দ্বারা সমাজের শীর্ষস্থানে উন্নীত করিয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতি-বিজড়িত স্থানের দেবালয়টি দর্শন করিলে লজ্জায় মস্তক অবনত হইয়া যায়।

আমাদের উদাসীনতায় ও অবহেলায় বিগ্রহের সেবা পর্যন্ত প্রতিদিন হয় না এবং দেবালয়টীও বর্তমানে যেরূপ জীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে ইহা ধূলিসাৎ হইতে আর দেরী নাই।

বর্তমান মন্দিরটী রঘুনাথ দাসের শ্রীপাট' বলিয়া খ্যাত এবং ইহার মধ্যে পূর্বোক্ত বিগ্রহগুলি ব্যতীত রঘুনাথের অন্যতম শিষ্য কমললোচন গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গদেবের' বিগ্রহ আছে ইহা ছাড়া যে প্রস্তরময় বেদীর উপর বসিয়া রঘুনাথ সাধনা করিতেন এবং তাঁহার ব্যবহৃত কাষ্ঠ-পাদুকাদ্বয়ও (খড়ম) যত্নের সহিত মন্দির মধ্যে সংরক্ষিত আছে। ভগবদ্‌ভক্ত স্বর্গীয় মতিলাল শীলের পিতামহী কর্তৃক এই মন্দির নির্মিত হইবার পর, ১৩১৬ সালে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সভ্য স্বর্গীয় অধ্যাপক হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের চেষ্টায় এবং রাজর্ষি বনমালী রায়, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রায়সাহেব রাধাগোবিন্দ রায়, কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ প্রমুখ কয়েকজন ভক্তের অর্থ সাহায্যে, মন্দিরের সামান্য কিছু সংস্কার হইয়াছিল। পরে ১৩৩০ সালে চুঁচুড়ার সদগোপবংশীয় শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষ নামক জনৈক ভক্ত পুনরায় মন্দিরের কিছু সংস্কার করিয়া দেন।

কৃষ্ণপুর শ্রীপাঠের মোহান্ত শ্রীগৌরগোপাল দাসঅধিকারী, অর্থাভাবে পঞ্চাশের মন্বন্তরে ঠাকুরের সেবা করা অসম্ভব হইলে তিনি শ্রীমদ্ রামদাস বাবাজীর নিকট এই বিষয় জ্ঞাপন করেন এবং ১৩৫০ সাল হইতে, রামদাস বাবাজীর অর্থসাহায্যে, বিগ্রহের সেবা কিছুদিন চলে। শ্রীবিজয় চক্রবর্তী বর্তমানে এই শ্রীপাঠের সেবায়েত।

শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড দেখিয়া ভক্তগণের হৃদয় ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া যায়। কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় হিন্দুগণ মুসলমানদের অত্যাচারে বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান এবং বৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দজীউ আজও জয়পুরে আছেন, তাহা সকলে জানেন।

মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনে যান তখন ঐ স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল ও উক্ত কুণ্ডদ্বয়ের চিহ্নমাত্রও ছিল না। তাঁহার সহিত শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, রঘুনাথ ভট্ট শ্রীজীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ দাস গোস্বামী

প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ ছিলেন। তাঁহারা মহাপ্রভুকে উক্ত কুণ্ডদ্বয়ের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তত্রস্থ কয়েকটি জলাভূমিকে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড বলিয়া দেখাইয়া দেন তাহা পূর্বেই লিখিত হইয়াছে।

মহাপ্রভু তারপর অন্যত্র চলিয়া যাইলে, রঘুনাথ সেই জলাভূমি ভগবৎ আরাধনার উপযুক্ত স্থান ভাবিয়া, তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কি উপায়ে শ্রীকৃষ্ণের এই পুণ্য জলাশয় দুইটিকে পূর্বের ন্যায় বিশালাকায় করিতে পারা যায়, সে বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে জলাভূমিগুলিকে মহাপ্রভু শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড বলিয়া দেখাইয়া দেন, সেই সকল জমি তখন অন্যলোকের তত্ত্বাবধানে ছিল। তখন রঘুনাথের কানে কেবল ঝঙ্কৃত হইত ঃ

'শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড গিরিগোবর্ধন
মধুর মধুর বংশী বাজে এইত বৃন্দাবন

রঘুনাথ যদিও সপ্তগ্রামের রাজপুত্র ছিল, তথাপি ত্যাগের পর তিনি ভিক্ষা করিয়া দিনাতিপাত করিতেন। প্রথমে তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বারে 'অযাচক-বৃত্তি' অবলম্বন করেন, পরে অযাচক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া 'মাধুকরী ভিক্ষা' স্বীকার করেন। রঘুনাথ 'মাধুকরী-ভিক্ষা' করিতেছেন শুনিয়া মহাপ্রভু আনন্দিত হইয়া বলেন 'সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি—বেশ্যার আচার।' মহাপ্রভু শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাগময়ী সেবায় রঘুনাথের রুচি দেখিয়া তিনি তাঁহার গুঞ্জমালা ও গোবর্ধনশিলা তাঁহাকে দান করেন ইহার পর হইতে রঘুনাথ কেবলমাত্র পথে পরিত্যক্ত ও বাসি মহাপ্রসাদ জলে ধুইয়া গ্রহণ করিতেন। মহাপ্রভু ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া একদিন রঘুনাথের নিকট হইতে সেই বাসি মহাপ্রসাদ বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়া তাহা আস্বাদন করেন।

রঘুনাথদাস গোস্বামী অতঃপর বৃন্দাবনের জমিগুলি যাহা অপরের হাতে ছিল তাহা ক্রয় করিতে লাগিলেন এবং পুনরায় তাহা খনন করাইয়া স্বচ্ছ জলাশয়ে পরিণত করিলেন।

মহাপ্রভুর ছয়জন পরিকরের মধ্যে অন্যতম শ্রীরঘুনাথের চেষ্টায় বৃন্দাবন আবার শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বলিয়া বৈষ্ণবগণের নিত্য আস্বাদনের বস্তু হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্বে বৃন্দাবন কুসুমসরোবরবাসী গোয়ালিয়র মন্দিরের মোহন্ত শ্রীযুক্ত উদ্ধারণ দাস বাবাজী রঘুনাথদাস কর্ত্তৃক ক্রীত ছয়খানি দলিল আবিষ্কার করিয়াছেন প্রথম দলিলখানি আশি টাকার দ্বিতীয় ও তৃতীয়খানি ত্রিশ টাকার চতুর্থখানি কুড়ি টাকার পঞ্চমখানি চৌদ্দ টাকার ও ষষ্ঠখানি চৌষট্টি টাকার। দলিলগুলি উর্দু ভাষায় লিখিত। স্বর্গীয় পণ্ডিত অমূল্যধন রায় ভট্ট উক্ত দলিলগুলির বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। এই দলিলগুলি শ্রীরাধাকৃষ্ণ বসু সম্পাদিত উড়িয়া সাপ্তাহিক পত্র 'ধর্ম সমাচারে' (২০শে সেপ্টেম্বর ১৯ ৯) প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীরাধাকুণ্ড বিষয়ক প্রাচীন দলিলের কপি বরাহনগর পাটবাড়ী 'শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরে' সংরক্ষিত আছে।

পাটবাড়ি শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরে'র গ্রন্থাগারিক শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাস বাবাজী রঘুনাথের সমস্ত দলিলগুলি আমায় দেখিতে দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। আমি পাঠকবর্গের অবগতির জন্য একখানি দলিল এবং উক্ত জমির দখল লইয়া যে মামলা হয় তাহার বিবরণ এবং রঘুনাথ কর্ত্তৃক শ্রীজীবগোস্বামীকে সমস্ত সম্পত্তি দানপত্রের দলিল কিরূপ ছিল তাহা এই স্থলে উল্লেখ করিলাম।

শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধাকুণ্ড উদ্ধারের পূর্বে উহা কৃষকদিগের কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ঐ সমুদায় কৃষিক্ষেত্র ৬ কিতা দলিল দ্বারা ২৩৮ টাকায় ক্রয় করিয়াছিলেন। নিম্নে ঐ দলিলগুলির মধ্যে প্রথমটির হুবহু নকল প্রদত্ত হইল।

১ম দলিল

খাদিম

সরাহা রুসুল

মুতহিন কৃতবুদ্দিন

তমসুকত্ত্ব মোহর সরিয়াত সাহা কাজি বদরুদ্দিন একরারসেত্ত্ব তাং ৯ জফর সন ৯৯৬ হিজিরা গরজইষ লেখকে ত্রহেকি মুসমিয়ান কাহাত্ত্ব লদ কানরো সলুয়া-ত্ত্ব তুশা অধীরাত্ত্ব-মুকসা, নজা-ত্ত্ব কল্লি কুজ্জাত্ত্ব অসুয়া গোবিন্দা ত্ত্ব চেহিয়া, ভূরিয়া ত্ত্ব কনকা। সা-মৌ অরটি উরক রাধাকুণ্ডু অমনা পরগণা সহর কেহেঁ। যো কি যমিন্ মজকুর। বা কৃষ্ণকুণ্ড

তরফ উত্তর করলি বড়া কুআঁ গোবিন্দা তরফ পূরব মাল ত্ব দরখং হিস্ ত্ব তরফ দক্ষিণ দেত্বালা মহাদেব। আপনি খুসিসে মোবালিক আশি (৮০) রূপিআ শিক্কা হাল মাঃ রঘুনাথ দাস যদি বদস্ত্র জীব গোসাই কোঁ ফরোকত কিয়া রূপিয়া অপনে খরচ-মে লায়া। অগর কোই দাবোদার হোত ঝুটা সমঝা যায়।

বঙ্গানুবাদ

কস্য তমস্সুকত্ব মোহর মুসলমানী আইনানুসারে সাহাকাজী বদরুদ্দি রেজিষ্টারী করিতেছেন। তারিখ ৯ই সফর, সন ৯৯৬ হিজরি। দাতা কাঁহা পিতা কলরু, শুনিয়া পিতা ভুশা, অধরা পিতা মুকসা, মজা পিতা কন্নি, কুঞ্জা পিতা অস্থুয়া, গোবিন্দ পিতা চোহরা, ভুরিয়া পিতা কনকা। সর্ব সাং অরিট ওরফে রাধাকুণ্ড, পরগণা অমলা, সহর কেঁহে ভূমির তপসিল চৌহুদ্দি। উত্তরে কৃষ্ণকুণ্ড ও গোবিন্দের বড় পুষ্করিণী। পূর্বে লাল জমি ও বৃক্ষ। দক্ষিণে মহাদেবের দোতলা বাড়ী।

আমরা সং নগদ ৮০ (আশি) টাকা রঘুনাথ দাসের মারফত বুঝিয়া পাইয়া জীব গোঁসাইকে উক্ত চৌহদ্দিস্থিত ভূমি সজ্ঞানে অন্যের বিনানুরোধে স্বেচ্ছাপূর্বক নিজ নিজ ইচ্ছায় হস্তান্তর করিলাম। যদি ভবিষ্যতে আমরা কিম্বা আমাদের কোন উত্তরাধিকারী অন্য কোন উত্তরাধিকারী বা অন্য কেহ কোন কোন প্রকারের ওজর-আপত্তি কিম্বা দাবী-দাওয়া করে, তাহা আইনত অগ্রাহ্য হইবে।

এক সময়ে নাথরাম নামক জনৈক মথুরাবাসী ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের কতক জমি বেদখল করিবার চেষ্টা করায় ও শ্রীরাধাকুণ্ডের নিকটবর্তী বৃক্ষলতাদি বলপূর্বক ছেদন করায় শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর অনুগত শ্রীযুক্ত গোপী দাস নামক জনৈক মহাত্মা ঐ সময়ে বাদশা সরকারে নালিশ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। নালিশের দরখাস্ত ও রায়ের নকল এই ঃ

দরখাস্ত

বাদসাহ মহম্মদ শাহাকা
ত্বখত ফিদবী সয়দ
গইরসরেইয়া বাহাদুর

সিজাত দস্তগা মহম্মদ হইয়াত লগায়ত উমেদবার হেকি গোপীদাস সাং কসবা বৃন্দাবনে দরবার কিআ কি মেরে বড়োনে মৌঃ রাধাকুণ্ড অমনা পরগণা শহরমে যমিন্ খরিদি তলাউ অওর বগিচা বনায়ে। ইন দিনো নাথেরাম সাং কসবা মথুরা চাহ তা হে অওর জবরদস্তি যমিন পর কবজা করতো হে। লিহাজা অরজ হে কি ইস মোকদ্দমেমে গৌর ফরমা কর দাদরসি করে। অওর উসকো মদাখিলত বেজা সে মনা কিআ যায়। তাং ১৭ সিবান সন ৫২।

বঙ্গানুবাদ

গোপীদাস সং কসবা, বৃন্দাবন এই বলিয়া অভিযোগ করিতেছে যে অমলা পরগণার অন্তর্গত রাধাকুণ্ড গ্রামে যে ভূমি খরিদ করিয়া পুষ্করিণী এবং বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই ভূমি বর্তমানে কসবা মথুরা নিবাসী নাথারাম নিজের বলিয়া দাবী করিয়া উক্ত ভূমি দখল করিয়াছেন। প্রার্থনা এই যে বিবাদীকে তলব করিয়া সুবিবেচনা পূর্বক ইহার সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়। ১৭ রিক সাবন সন ৫২।

উক্ত মোকদ্দমার রায়ের বঙ্গানুবাদ

ফৌজদারী হাল ও ইস্তাকনা পরগণা ইসনানাবাদ। মথুরা বদানদ। নবাব কুতুবুদ্দিনের মোহরযুক্ত ১৭ই সিবান সন ২০। আমি ইহা ভালরূপে বুঝিতে পারিয়াছি যে, বৃন্দাবন নিবাসী গোপীদাস অরিট ওরফে রাধাকুণ্ড গ্রামে ভূমি খরিদ করিয়া তাহাতে পুষ্করিণী খনন ও বাগান তৈয়ার করিয়াছে। কসবা নিবাসী নাথারাম দাস নামক এক ব্রাহ্ম অন্যান্য লোকের সহিত মিলিত হইয়া যোগসাজাসে ঐ ভূমির কিয়দংশ দখল করিয়া লইয়াছে। আমি অনেকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া জানিতে পারিলাম যে. এই জমির একমাত্র দখলকার জীব গোঁসাই। ইহার অন্য কোন অংশীদার নাই। বিবাদী ইহার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করিবে। হিজরি সন ৫২। উক্ত জমিগুলি শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীজীব গোস্বামীকে যে হেবানামা (দানপত্র) প্রদান করেন তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে লিখিত হইল ঃ

কস্য দানপত্র মোহর মুসলমানী আইনানানুসারে কাজি বদরুদ্দিন রেজেষ্টারী করিতেছেন। তারিখ ৭ই রিক, রজব মাস, সন ৯৯৬ হিজরী।

আমি গোঁসাই রঘুনাথ দাসের নিকট হইতে মৌজা অরি পরগণাট অমলা সহর বমজীব অন্তর্গত যে ছয় খণ্ড ভূমি দুইশত ৩৮ টাকায় খরিদ করিয়াছিলাম, তাহা সজ্ঞানে স্বেচ্ছাপূর্বক আপন ইচ্ছাতে জীব গোঁসাই পিতা বল্লব গোঁসাইয়ের নিকট বিক্রয় করিলাম এবং ৭০ টাকা নগদ বুঝিয়া পাইলাম। ঐ জমি সংক্রান্ত যে সকল দলিলপত্রাদি আমার নিকট ছিল, তাহাও গোঁসাই মহাশয়কে দিয়া দিলাম। যাহাতে ভবিষ্যতে কেহ কোনপ্রকার ওজর-আপত্তি ও দাবী না করিতে পারে।

তপসিল চৌহুদ্দি

(১) উত্তর-পূর্ব তমসুখ মোবারক খাঁ ২১ রজব সন ৯৫৪ হিজরী।

(২) উত্তর গোবিন্দের কদলী বৃক্ষের বাগান, নদ্দমা—দক্ষিণে মহাদেবের দ্বিতল গৃহ। ৯ই সফর সন ৯৬০ হিজরী মূল্য ৮০ টাকা।

(৩) দক্ষিণ-পশ্চিম—মোবারক খাঁর জমি ১৭ সওয়াল হিজরী ৯৫৩। মূল্য ৩০ টাকা।

(৪) দক্ষিণ-পশ্চিম ও পূর্ব—তমসুখ মোবারক খাঁ ১৮ই সওয়ান হিজরী ৯৫৩। মূল্য ৩০ টাকা।

(৫) দক্ষিণ—ঘাট ও বৃক্ষ মোবারক খাঁ। ১৫ জমাদিয়াসানি সন ৯৮৫ হিজরী। মূল্য ২০।

(৬) উত্তর—মোবারক খাঁর জমি। ১১ সফর ৯৮১ হিজরী। মূল্য ১৪ টাকা।

(৭) উত্তর—মোবারক খাঁর কলাগাছ ও নিমগাছ। ৯ই সফর সন ৯৮৫ হিজরী। মূল্য ৬৪ টাকা।

কালক্রমে শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড পুনরায় জঙ্গলাবৃত হইলে বৈষ্ণবকুলতিলক লালাবাবু উক্ত কুণ্ডদ্বয় পুনরায় সংস্কার করিয়া উভয় কুণ্ডের মধ্যে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি সেতু নির্মাণ করিয়া দেন। কান্দী রাজবংশের এই মহাত্মা অনাবৃত অবস্থায় শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে বসিয়া সাধন-ভজন করিতেন। এই সম্বন্ধে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১৭ জুন তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা এইরূপ ঃ

শ্রীবৃন্দাবন তীর্থের অন্তঃপাতি রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড এই দুই তীর্থস্থান অপরিষ্কারে জঙ্গল হইয়া লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তিনি [লালাবাবু] সে দুই স্থান পুনর্বার সংস্কার করিয়া পূর্ব হইতে অধিক শোভ ন্বিত করিয়াছেন। লোকে কহে তাহাতে ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

।। একটি অপপ্রচার ।।

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ কর্তৃক সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'অগ্নি-পুরাণে' লিখিত বলিয়া একটি কাল্পনিক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তিনি রঘুনাথকে শূদ্র বলিয়া লিখিয়াছেন। শব্দকল্পদ্রুমের ১ম সংস্করণে ঐ শ্লোকটি আবির্ভূত হয়। কিন্তু এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে অগ্নিপুরাণের যতগুলি পুঁথি আছে কোথায়ও এই শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায় না। রঘুনাথ তথা সমগ্র কায়স্থজাতিকে হেয় করিবার জন্য অগ্নিপুরাণ' হইতে গৃহীত বলিয়া যে কল্পিত বচনটি রাধাগোবিন্দবাবুও উদ্ধার করিয়াছেন উহা কোন প্রাচীন গ্রন্থে নাই। শ্রীসীতারাম ওঙ্কারনাথও তাঁহার পত্রে (স্তবকুসমাঞ্জলি, ১৬৩) 'কায়স্থ যে শূদ্র তা অগ্নিপুরাণে স্পষ্টভাবে কথিত হয়েছে' বলিয়া উল্লেখ করায় বাংলার মহান কায়স্থ সমাজ তাঁহার অনৈতিহাসিক, অশাস্ত্রীয় ও অশোভন উক্তিতে বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন। এই সম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটির কর্ণধার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ফরিদপুর আর্যকায়স্থ সমিতির সম্পাদকদের নিকট যে পত্র দিয়াছিলেন তাহা ১২৯৭ সালের কার্তিক মাসের 'আর্যকায়স্থ প্রতিভা' পত্রে (পৃষ্ঠা ২৯১—২৯২) প্রকাশিত হয়। রঘুনাথ সম্বন্ধে হীন উক্তির প্রতিবাদকল্পে রাজা রাজেন্দ্রলালের সেই অবিস্মরণীয় পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

8 Maniktollah Road, Dec. 13th, 1890.

Babu Brajendrakumar Ghose Barma and Babu Chaitanyakrishna Nag Barma Arya Kayastha Samiti, Fu:ridpore.

Dear Sirs,

Owing to ill health I have not been able to answer your querry of the 4th Sept. last. I have now examined the Agnipurana and find that the slokas you have cited are not found in any standard M. S. in fact I have not seen them anywhere, and the ont's of proving their authenticity lies with your antagonist and not with you. It is easy enough to write out Sanskrit anustop verses on any conceivable subject, but citations of such questionable character are not worth refuting. **They cannot be subject of proof.**

Yours truly.
(Sd) Rajendra Lall Mitra.

বঙ্গানুবাদ ঃ শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ আপনাদের বিগত ৭ঠা সেপ্টেম্বরের পত্রে যে জিজ্ঞাসা বিষয় ছিল, তাহার উত্তর প্রদান করিতে সক্ষম হই নাই। এখন আমি 'অগ্নিপুরাণ' পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, আপনাদের উদ্ধৃত বচন কোন সর্বমান্য হস্তলিখিত গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ফলতঃ কোন গ্রন্থেই প্রাপ্তব্য নহে। সুতরাং উক্ত বচনের প্রকৃততা সপ্রমাণ করিবার ভার আপনাদের প্রতিপক্ষের উপর অর্পিত আছে—আপনাদের উপর নহে। কোন চিন্তনীয় বিষয়ে সংস্কৃত অনুষ্টুপ ছন্দে শ্লোক রচনা করা অতি সহজ বটে কিন্তু এই প্রকার উদ্ধৃত বচন কখনই প্রতিবাদের যোগ্য নহে। ঐ সকল শ্লোক প্রমাণের বিষয় হইতে পারে না।

কবি নাভাজী হিন্দিভাষায় 'ভক্তমাল' গ্রন্থ রচন করেন ; উহাতে ভারতের প্রসিদ্ধ সাধক ও ভক্তবৃন্দের জীবনী লিখিত আছে। লালদাস বাবাজী নাভাজী কৃত হিন্দী ভক্তমাল হইতে বঙ্গভাষায় প্রথম 'ভক্তমাল' রচনা করেন। উহাতে রঘুনাথ-প্রসঙ্গ পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ঃ

রঘুনাথ শ্রীমান দাস যে গোস্বামী।
অনুরাগ পরকাষ্ঠা শ্রীরাধা-গোবিন্দে।
শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপাবলে বৈরাগ্য জন্মিল।
সুন্দরী যুবতী নারী ভূষণে ভূষিত।
সর্বত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে।
নিকষিয়া যায় পুন পুন ধরি আনে।
নবলক্ষের রাজ্যাস্পদ সোঁপিল তাহারে।
তথায় রাখিতে নারে কৃষ্ণ অনুরাগে।
অনেক পহরা চৌকি বাঁধিয়া হারিল।
রঘুনাথ উৎকণ্ঠিত গৌরাঙ্গ বলিয়া।
কেহ শিষ্ট লোক কহে অনুচিত ইহ।
এ হেন ঐশ্বর্য আর এ যুবতী নারী।
পট্টরজ্জু দিয়া কি বাঁধিয়া রাখা যায়।
এত শুনি বন্ধন খুলিয়া নিজ জন।
তেঁহো হেঁটমাথে রহে কিছু নাহি কহে।
লোক চৌকি রাখি সভে সতর্ক রহিল।
অতি উৎকণ্ঠিত মন উন্মত্তের প্রায়।
জল কি জঙ্গল তৃণ কণ্টক শর্করা।
বারো দিনে উত্তরিলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পুরুষোত্তম গিয়া শ্রীমান চৈতন্যচরণে।
হে নাথ হে প্রভো হে করুণা নিধন।
অনাথ অধম মুঞি গতিহীন দীন।
শ্রীচরণতলে পড়ি ধুলায় ধূসর॥
কাতর দেখিয়া প্রভুর দয়া উপজিল।
শক্তি সঞ্চারিয়া তবে প্রেমভক্তি দিল।
শ্রীমান দাস রঘুনাথ নাম হৈল খ্যাত।
সিংদ্বারি থাকি কৈল অযাচক বৃত্তি।
শড়া মহাপ্রসাদ যাহা কুণ্ডেতে ডারয়ে।
তাহাই আহার মাত্র প্রাণরক্ষা কাজে।
প্রভু তাহা শুনি অতি আনন্দিত হঞা।
প্রভুর আজ্ঞায় দাস গোস্বামি মহান।
শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে করিলেন বাস।
রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি লাগি সদা উৎকণ্ঠিত।
হে হে বৃন্দাবনেশ্বরি হে ব্রজনাগর।
নিদ্রাহার নাহি সদা করয়ে ফুৎকার।
দাস গোস্বামীর পূর্বাপর যত লীলা।
প্রচণ্ড বৈরাগ্য যাঁর মহ ভক্ত প্রেমী॥
দিবানিশি নাহি জানে মত্ত প্রেমানন্দে॥
পিতার যে রাজ্যাস্পদ তাহে ঘৃণা হৈল॥
বিষতুল্য মানে তাহা হেরিয়া কম্পিত॥
যাইয়া প্রপন্ন হইবারে হৈল মনে॥
পিতামাতা কাতর সদাই দুঃখ মনে॥
অপ্সরার তুল্য যে যুবতী নারী ঘরে॥
সে সকল তুচ্ছ করি বিষয়ভয়ে ভাগে॥
শেষে রজ্জু দিয়া হাত বাঁধিয়া রাখিল॥
উচ্চস্বরে কান্দে সাধু ভূমেতে পড়িয়া॥
নির্বোধ তোমরা কেহ বুঝিতে নারহ॥
হেন রজ্জু ছিন্দে যেই তারে হরি হরি॥
কেন বৃথা বান্ধ খুলি দেহ হায় হায়॥
অনেক বুঝায় সভে করিয়া ক্রন্দন॥
গৌরাঙ্গ হৃদয়ে যথা গ্রহ চাপে দেহে॥
রাত্রিযোগে রঘুনাথ উঠি পলাইল॥
দিগ্‌বিদিগ নাহি ফিরিয়া তাকায়॥
নাহি মানে যম মাত্র বাউলের পারা॥
তার মধ্যে তিন সন্ধ্যা আহার যে নাম॥
পড়িলা হঠাৎ গিয়া করিয়া ক্রন্দনে॥
কৃপা কর শ্রীচরণে লইনু শরণ॥
কৃপাবলোকন কর জানিয়া অধীন॥
স্তুতিনতি করে অতি কাতর অন্তর॥
মুচকি হাসিয়া তুলি আলিঙ্গন কৈল॥
নিজ পারিষদে প্রভু প্রধনে গণিল॥
পরম বৈরাগ্য কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত॥
কথোদিনে তাহা ছাড়ি কৈল কিছু যুক্তি॥
ধুইয় তাহার মধ্যে কণা যা থাকয়ে।
বিষয় সুখের লেশমাত্র নাহি ভুঞ্জে।
প্রসংসেন অন্য ভক্তগণে শুনাইয়া॥
কথো দিনে কৈল বৃন্দাবনেরে গমন॥
দিবানিশি সদা রাধাকৃষ্ণ প্রেমোল্লাস॥
সদা হাহাকার শব্দে স্থির নহে চিত॥
দেখাইয়া শ্রীচরণ প্রাণ রাখ মোর॥
বাহ্যস্ফূর্তি নাহি সদা যেন মাতোয়ার॥
কহিতে নারি এ কিছু সংক্ষেপে বর্ণিলা॥

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী 'শ্রীশ্রীহরি ভক্তিবিলাসে'র ১।২ শ্লোকের টীকায় শ্রীরঘুনাথ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ শ্রীরঘুনাথ দাসোনাম গৌড়-কায়স্থকুলাব্জভাস্করঃ পরমভাগবতঃ ইত্যাদি।

রঘুনাথ গোস্বামীর শ্রীপাঠে বহু প্রাচীন পুঁথি ছিল, কিন্তু কালক্রমে উহার অধিকাংশ নষ্ট অথবা বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক স্থানান্তরিত হইয়াছে। এইস্থানে একখানি প্রাচীন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পুঁথি আমি দেখিয়াছি; উহার শেষে এই কথাগুলি লিখিত আছে ঃ

'শাকেসিন্ধ্বস্নিবানেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যোক্ষসিত পঞ্চম্যাংগ্রন্থোয়ং পূর্ন্নতাংগতঃ।
শ্রীমন্মদনগোপাল গোবিন্দদেবতুষ্টয়ে।
চৈনন্যর্পিতমস্তেতু চৈতন্যচরিতামৃতং।

যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং দোসনাসকং। শ্রীমাধবদাসস্য, সাং গাড়াঘাটা।' ইহা হইতে ৫৩৭ শকাব্দে উক্ত গ্রন্থ শ্রীমাধব দাস কর্তৃক নকল করা হইয়াছিল জানা যায়।

ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি বাংলার জাতীয়-গৌরব শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ন্যায় কয়জন মহাপুরুষ বাংলা দেশকে পবিত্র করিয়াছেন? রঘুনাথ প্রবর্তিত পুণ্যসলিলা সরস্বতীর উপকূলে প্রতি বৎসর যে উত্তরায়ণ মেলার (১লা মাঘ) অনুষ্ঠান আজ সাড়ে চারিশত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহার সংবাদই বা কয়জন জানেন?

জাতীয় মহাপুরুষদিগের মহিমা বিস্মৃত হওয়া যে আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। শ্রীভগবানের অংশ সম্ভূত রঘুনাথ জীবের প্রতি কৃপা বিতরণের জন্য নরাকারে যে স্থানে এবং যে জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি বিজড়িত সেই স্থানের রক্ষাকল্পে, যদি আমরা সচেষ্ট না হই—আমাদের অবহেলায় ও উদাসীনতায় যদি মানবকুল উদ্ধারকারী প্রেমময় মহাত্মার নাম এবং মানব জাতি ও বৈষ্ণব সংস্কৃতির মূর্ত-প্রতীক চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের আর যে কোন আশা নাই, একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

কৃষ্ণপুরে বর্তমানে ২০ ঘর হিন্দু ও ৩০ ঘর মুসলমানের বাস আছে। অবস্থাপন্ন লোক গ্রামে কেহই নাই। সম্প্রতি গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডের সপ্তগ্রাম হইতে কৃষ্ণপুরের শ্রীপাট পর্যন্ত যে এক মাইল কাঁচা রাস্তা আছে, উহার নাম রঘুনাথদাস গোস্বামী রোড। এই রাস্তাটি পাকা করিলে যাতায়াতের খুব সুবিধা হয়। গ্রামে প্রবেশ করিলেই দেখা যায় নুড়ি ইঁট ও শিবলিঙ্গের ভগ্ন প্রস্তর খণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। উহা হইতে এই গ্রাম যে এক সময় বর্ধিষ্ণু ছিল তাহা প্রমাণিত হয়। সরকারী উদ্যোগে পুরাতত্ত্ব বিভাগ যদি অন্বেষণ করেন তবে বহু প্রাচীন ঐতিহ্য ও মূল্যবান দ্রব্যাদি এই স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইতে পারে। সম্প্রতি এই গ্রন্থের লেখক এই স্থান হইতে একখানি পঞ্চদশ শতাব্দীর কারুকার্যখচিত ইষ্টক আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার বিবরণ ৭৫৯—৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

কৃষ্ণপুরে বাঁশবন ও ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি জোড়া শিবমন্দির আছে। উহা '১৭২০ শকাব্দে' প্রতিষ্ঠিত বলিয়া লেখা আছে। মন্দিরের মধ্যস্থিত শিবলিঙ্গ চামচিকির মলত্যাগে আবৃত হইয়া আছে। পূজাও বহুদিন হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সরকার বংশীয়গণ। তাঁহাদের বাস্তুভিটা দেখিলে মনে হয়, একদা তাঁহাদের অবস্থা ভাল ছিল। শ্রীপুর গ্রামের শ্রীরাখাল সরকার এই বংশের লোক ছিলেন বলিয়া শোনা যায়। কৃষ্ণপুরের প্রাচীন নিদর্শন হিসাবে এই জোড়া শিবমন্দির সংরক্ষিত হওয়া উচিৎ। গত লোক গণনায় কৃষ্ণপুরের জনসংখ্যা ২৭৯ জন ছিল।

কালিদাস মজুমদার ঃ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জ্ঞাতি খুড়া। বৈষ্ণবের পদরজে এবং বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে ইঁহার অচলা নিষ্ঠা ছিল। ইনি সাক্ষাতভাবে বা কৌশলে পরিচিত সকল বৈষ্ণবেরই পদরজঃ ও অধরামৃত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছু উপহার লইয়া তিনি বৈষ্ণব গৃহে যাইতেন। তাঁহার নিকটে বৈষ্ণবের জাতিবিচার ছিল না। এক সময়ে তিনি ভূমিমালী জাতীয় বৈষ্ণব ঝড়ুঠাকুরের গৃহে একটি ঠোঙ্গায় করিয়া

কতকগুলি আম লইয়া গিয়াছিলেন। যাইয়া ঝড়ুঠাকুরকে এবং তাঁহার পত্নীকে প্রণাম করিয়া কতক্ষণ কৃষ্ণকথার আলাপন করিয়া চলিয়া আসিতেছিলেন। ঝড়ুঠাকুরও তাঁহার অনুগমন করিয়া কতদূর পর্যন্ত যাইয়া তাঁহারই অনুরোধে গৃহে ফিরিয়া আসেন। তিনি চক্ষুর অন্তরালে যাইলে যে স্থান দিয়া তিনি যাতায়াত করিয়াছিলেন, কালিদাস সেই স্থানের ধূলি লইয়া সর্বাঙ্গে মাখিলেন এবং জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়া দেখিলেন ঝড়ুঠাকুর এবং তাঁহার পত্নী কৃষ্ণনিবেদিত আম খাইয়া চোষা আটি ও বল্কল আস্তকুড়ে ফেলিয়া দিলেন। কালিদাস গোপনে আস্তাকুড় হইতে সেই চোষা আটি-আদি লইয়া চুষিতে লাগিলেন এবং প্রেমাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার এই বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টাদিতে নিষ্ঠার ফলে, যখন তিনি নীলাচলে গিয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভুর অসাধারণ কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। প্রভু যখন শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করিতেন, সিংহদ্বারের নিকটে আসিয়া প্রথমে পাদ-প্রক্ষালন করিয়া তার পরে মন্দির প্রাঙ্গণে যাইতেন। প্রভুর এই পদজল কেহ যেন স্পর্শও না করে—এইরূপই ছিল গোবিন্দের প্রতি প্রভুর আদেশ। একদিন প্রভু পাদ-প্রক্ষালন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহারই সাক্ষাতে কালিদাস ক্রমে ক্রমে তিনঅঞ্জলী পাদোদক গ্রহণ করিলেন, প্রভু তাঁকে নিষেধ করিলেন না; তিনঅঞ্জলী গ্রহণের পরে নিষেধ করিলেন। ইহার পরে প্রভু নিজেই গোবিন্দদ্বারা তাঁহাকে নিজের ভুক্তাবশেষও দেওয়াইয়াছিলেন। ইনি ব্রজলীলায় ছিলেন পুলিন্দতনয় মল্লা।

যদুনন্দন আচার্য: সপ্তগ্রামবাসী শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের অন্তরঙ্গ শিষ্য। বাসুদেব দত্তের অনুগৃহীত। রঘুনাথদাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু। ইনি নিজের অজ্ঞাতসারেই দাস গোস্বামীর গৃহত্যাগের সহায় হইয়াছিলেন। তাঁহার গৃহস্থিত শ্রীবিগ্রহের সেবক—ব্রাহ্মণ সেবা ছাড়িয়া চলিয়া গেলে তিনি দণ্ড-চারি রাত্র থাকিতে রঘুনাথ দাসের নিকটে আসিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে সাধিয়া আনিবার জন্য রঘুনাথকে বলিলেন; সেবার জন্য আর কোনও ব্রাহ্মণ ছিল না। রঘুনাথের সঙ্গে সেই ব্রাহ্মণের সম্প্রীতি ছিল। তখন রঘুনাথের প্রহরীগণ নিদ্রিত। আচার্য রঘুনাথকে লইয়া চলিলেন। আচার্যের গৃহের নিকটে

আসিলে রঘুনাথ তাঁহাকে বলিলেন—'আপনি গৃহে ফিরিয়া যাউন। আমি ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া দিব। আমাকে অনুমতি করুন।' রঘুনাথ যে কৌশলক্রমে নীলাচলে যাওয়ার অনুমতিই চাহিলেন, যদুনন্দন আচার্য তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি রঘুনাথকে অনুমতি দিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। এদিকে রঘুনাথও নীলাচলের দিকে যাওয়ার জন্য অগ্রসর হইলেন।

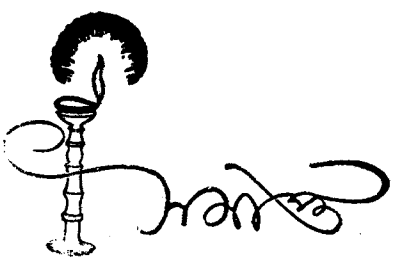

কমলা প্রেস
মল্লিক কাশিম হাট
হুগলী